সাক্ষাৎকার

আমার কাছে কার্টুন হলো মোর দেন আর্ট

এরশাদের আমলে ভয় পেতাম না, এখন কিছুটা বিপন্নবোধ করি

আলাপচারিতায় শিশির ভট্টাচার্য্য

মারুফ রায়হান

শিশির ভট্টাচার্য্য সময়ের সাহসী সন্তান। বিখ্যাত, কুখ্যাত, আলোচিত, বিতর্কিত সব ব্যক্তি এবং ব্যক্তির কাজ-অকাজ নিয়ে শীর্ষ জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতার জন্যে ধারাবাহিকভাবে কার্টুন এঁকে সারা দেশে স্বনামে খ্যাতিমান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ড্রইং ও পেইন্টিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। দেশ-বিদেশের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী এই ব্যতিক্রমী গুণী শিল্পী থাকেন রাজধানীর কাঁঠালবাগান বাজার এলাকায়। তাঁর ছবি ও কার্টুনে এই এলাকা বারবার এসেছে। বর্তমান সাক্ষাৎকারে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর ভাবনাজগৎ, কর্মপদ্ধতির রহস্য, অন্তরঙ্গ ভুবন

মারুফ রায়হান : শৈশবে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে, বড় হয়ে কেউ ডাক্তার হবেন, নাকি শিল্পী হবেন, নাকি অন্য কিছু। ছেলেবেলার দিকে তাকিয়ে আপনি এমন কোনো স্মৃতি বা কৌতূহলের কথা মনে করতে পারেন কিনা যেটা দিয়ে শনাক্ত করা যেতে পারে আজকের দিনের শিল্পী ও কার্টুনিস্ট শিশিরকে।

শিশির ভট্টাচার্য্য : ছোটবেলায় আমি পোর্ট্রেট করতে পারতাম। প্রতিকৃতি আঁকতে পারা মানেই ছবি আঁকতে পারা। আমি তখন ফাইভ-সিক্সে পড়ি। এক বন্ধুকে গিফট করতে হবে কী যেন একটা উপলক্ষে। আমি ওর ছবি দেখে পোর্ট্রেট আঁকলাম। ওর ছবির সঙ্গে আঁকা ছবিটার হুবহু মিলে যাওয়া দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। আমার নিজেরও একটা জাজমেন্ট হলো। এরপর আমি বেশ কিছু পোর্ট্রেট এঁকেছি, দেখে দেখে অন্য ছবিও এঁকেছি। এভাবে অন্যদের ইন্টারএকশনের মাধ্যমে আমারও ইন্টারেস্ট তৈরি হতে থাকলো। মনে আছে, সে-সময় ঠাকুরগাঁওয়ে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ-সুকান্ত তিনজনের সম্মিলিত জন্মজয়ন্তির অনুষ্ঠান হতো। মঞ্চের পেছনে তিনজনের ছবি থাকতো। তিন কবির প্রতিকৃতি বড় করে আমি এঁকে দিতাম অনুষ্ঠানের জন্যে। ক্লাসে অমনোযোগী হওয়ার শাস্তিস্বরূপ ছবি আঁকার দণ্ড দেয়া হতো আমাকে– এমনও হয়েছে। স্যার হঠাৎ লক্ষ্য করলেন তার কথা শুনছি না। শিক্ষক দেখলেন যে, আমি খাতায় আঁকিবুকি করছি। রেগে গিয়ে বললেন, ও তুমি ছবি আঁকছো? যাও ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে আঁকো তো আমাকে। এই বলে তিনি বেশ পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি পরীক্ষা দিতে থাকলাম ছবি আঁকার। ছবি আঁকা শেষ হলে স্যার আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। ওদিকে আবার ছবিটা মুছেও দিতে হবে বোর্ড থেকে, সেজন্যে একটা দ্বিধা তাঁর মনে।

শিল্পী, কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য্য, ২০০৬

যাই হোক, এরকম মজার ঘটনা অনেক আছে।

তিয়াত্তর সালের দিকে একবার হাইস্কুলে হেডমাস্টার কাদের মণ্ডল, বাংলার জালাল স্যার– এরা মিলে একটি দেশপ্রেমমূলক গান লিখে সুর দিলেন। প্রকৃতির বর্ণনা আছে গানটায়, ওটা শুনে শুনে প্রকৃতির ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হবে স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। আমাদের চার প্রতিযোগীর হাতে রঙিন চক দেয়া হলো। মঞ্চে গান শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমরা ছবি আঁকা শুরু করলাম। গানও শেষ আঁকাও শেষ। অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা। ন্যাচারালি আমি ভালো করলাম, পুরস্কার পেলাম। এটা ছাড়াও আরো একটি ঘটনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সেটাও ওই তিয়াত্তরেরই। বঙ্গবন্ধু ঠাকুরগাঁওয়ে এলেন। তাঁকে যে-সকল উপহার দেয়া হবে সে-তালিকায় আমার আঁকা বঙ্গবন্ধুর একটি স্কেচও ছিল। ঠাকুরগাঁওয়ের ফুটবল খেলার বিশাল মাঠে সভা হবে। উঁচু স্টেজ। অসম্ভব ভিড়। কিন্তু আমাকে তো স্টেজে গিয়ে প্রাপকের হাতে তুলে দিতে হবে উপহারটি। তখনও আমি হাফ প্যান্ট পরি। বঙ্গবন্ধু উপহারটি নিলেন, জনতাকে সেটা দেখালেন। আমাকেও তিনি উঁচু করে তুলে ধরে ঠাকুরগাঁওবাসীকে বললেন, 'দ্যাখেন, আপনাদের ছেলে আমাকে আমার ছবি উপহার দিয়েছে।' বলা যায়, এভাবেই ছবি আঁকার স্বীকৃতি পেলাম, আত্মবিশ্বাসও বাড়তে লাগলো।

আবু সাঈদ চৌধুরী তখন রাষ্ট্রপতি। দেশের কোনো একটি গ্রাম সেই প্রথম সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করে এই ঠাকুরগাঁওয়েই। এ উপলক্ষে মেলা হলো। মেলার প্রথম স্টলটি ছিল আমার। সেখানে আমার আঁকা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশ কিছু ছবি, যেমন পাকিস্তানি সেনার অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই, সাধারণ মানুষের হাহাকার ইত্যাদি ছবি রয়েছে।

বলা যায়, আমার প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী ছিল ওটা। রাষ্ট্রপতি এলেন। এর আগে বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ নিতে পারিনি, জানতামও না এই অটোগ্রাফ নেয়ার আকর্ষণটি। এবার আর একই ভুল করতে চাই না। খাতা নিয়ে রেডি। রাষ্ট্রপতি লিখলেন, 'শিশিরকে শুভেচ্ছা জানাই'। আবুল কাশেম সন্দ্বীপ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এই অটোগ্রাফ দেয়ার ঘটনা নিয়ে তিনি একটি লেখাও লিখেছিলেন পরে। খাতাটা আছে এখনো, দেখতে মজাই লাগে।

পঁচাত্তরে ম্যাট্রিক দিলাম। যেদিন রেজাল্ট বেরুবে সেদিন ১৫ই আগস্ট, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। খুব ভয়ে ভয়ে গেছি রেজাল্ট আনতে। যাহোক, পরীক্ষায় পাসের পর ঠাকুরগাঁওয়েই কলেজে ভর্তি হলাম, ঢাকার আর্ট কলেজে নয়। সামর্থ্য না থাকলে স্বপ্ন নিয়ে দাপট দেখানো চলে না মধ্যবিত্ত পরিবারে। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ, এরপর ঢাকায় কোথায় কীভাবে থাকবো সেই অনিশ্চয়তায় প্রথমে ঢাকায় পড়া হলো না আমার। এটা আমাকে ভীষণ পীড়া দিয়েছিলো। ওই সময় কামরুল হাসানের ব্রাশের অনেক স্কেচ আমি কপি করার চেষ্টা করতাম। জয়নুল-কামরুল-কাইয়ুম– এঁদের ছবির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। ঠাকুরগাঁওয়ের মুহম্মদ ইউনুস তখন আর্ট কলেজে পড়েন, তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। প্রস্তুতিও নিতে শুরু করলাম আর্ট কলেজে ভর্তির।

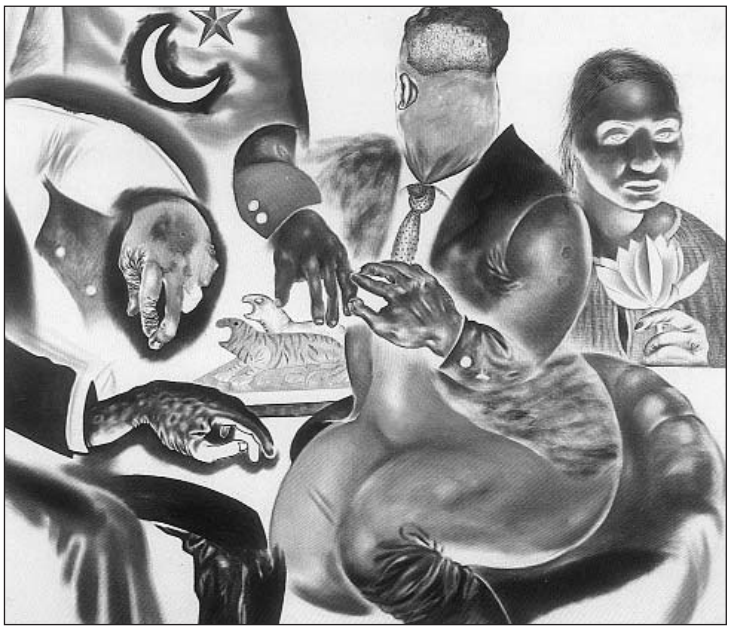

শিশির ভট্টাচার্য্যের চিত্রকর্ম : হতে পারতো নায়কের গল্প, ১৯৮৭

মারুফ : আচ্ছা, মাঝখানে আপনার বাবা-মায়ের কথা কিছু শুনি। বাবার পেশা কী ছিল? বাবা-মা কি আপনার আঁকাআঁকিকে সমর্থন করতেন?

শিশির : হ্যাঁ। পরিবারের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি সবসময়। বাবা ছিলেন কবিরাজ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একাডেমিক শিক্ষা ছিল তাঁর। তিনি ওষুধ বানাতেন, একটা দোকান ছিল শহরে। খুব একটা সচ্ছলতা ছিল না আমাদের পরিবারে। আমরা পাঁচ ভাই, চার বোন। ভাইদের মধ্যে আমি তৃতীয়, আমার বড় এক বোন আছেন। আমি মায়ের কাছ থেকেই শিল্পবোধ, শিল্পের প্রতি ঝোঁক, ভালোবাসা– এসব পেয়েছি। শিল্পের প্রতি প্রবল ভালোবাসা ছিল তাঁর, কিছুটা চর্চাও করতেন। বলা যায়, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মতোই স্বশিক্ষিত ছিলেন তিনি।

মারুফ : আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার আগের সময় সম্পর্কে বলছিলেন...

শিশির : ম্যাট্রিকে আমার ভালো রেজাল্ট ছিল, অতটা ভালো হয়নি ইন্টারমিডিয়েটে। এক রকম হাল ছেড়েই দিয়েছি আর্ট কলেজে ভর্তির ব্যাপারে। সে-সময় বাবার দোকানের ভেতর পার্টিশন দিয়ে রূপায়ণ নামে পৃথক একটি ঘর করে নিলাম। বড় করে ববিতার মুখ এঁকেছিলাম। ওটা দেখার জন্যে ভিড় থাকতো আমার দোকানে। ওখানে ছবি আঁকা, সাইনবোর্ড তৈরি ইত্যাদি কাজ করতাম। তবে বেশি করতাম পোর্ট্রেট, আর রিকশার ডেকোরেশনের জন্যে বিচিত্র সব ছবি। এনিমেল এনসাইক্লোপেডিয়া, বা রূপকথার গল্পে যেসব ছবি থাকে তার অনুসরণে আমি রিকশা ডেকোরেশনের জন্যে ছবি আঁকতাম। ফলে ভালো ডিমান্ড ছিল তার। একবার বানরের ছবি আঁকলাম একটা রিকশার জন্যে। রিকশার মালিক খুশি। রিকশাঅলা শহরে বেরিয়েছে রিকশা নিয়ে কিন্তু তার রিকশায় কেউ ওঠে না। সবাই অসন্তুষ্ট। তাদের মনোভাব এরকম, দূর, ঘর থেকে বেরিয়েই বান্দরের মুখ দেখতে হলো। বাধ্য হয়ে আমাকে ছবিটা বদলে দিতে হয়েছিলো। এছাড়া পিটিআই ট্রেনিংয়ের সময় আঁকাআঁকির চাপ বেড়ে যেতো। ওরা তো ছবি আঁকতে পারতো না, পয়সার বিনিময়ে আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতো। বাংলাদেশের ম্যাপ আঁকা থেকে শুরু করে গল্পের ইলাসট্রেশান পর্যন্ত করেছি। আমার উপার্জন ভালোই হতো। মায়ের হাতে তুলে দিতাম সেই টাকা। যাহোক, ইউনুস ভাই আর্ট কলেজের ছুটিছাটায় বাড়ি এলে আমি আমার আঁকা ছবি তাঁকে দেখাতাম।

বাবা ছিলেন কবিরাজ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একাডেমিক শিক্ষা ছিল তাঁর। তিনি ওষুধ বানাতেন, একটা দোকান ছিল শহরে। খুব একটা সচ্ছলতা ছিল না আমাদের পরিবারে।

মারুফ : বাজার থেকে রঙ কিনেই আঁকতেন, নাকি নিজস্ব কোনো উদ্ভাবনী ছিল আপনার?

শিশির : বাজার থেকেই কিনতাম। চাইনিজ ইঙ্ক আর জাপানিজ ওয়াটার কালার পাওয়া যেতো। প্যাস্টেল কালার, কালার পেন্সিল এগুলোও পাওয়া যেতো। স্কেচ আঁকার জন্যে সফ্‌ট পেন্সিলও সহজলভ্য ছিলো।

মারুফ : আর্ট কলেজে কীভাবে ভর্তি হলেন?

শিশির : এর পেছনে প্রধানত মায়ের উৎসাহ কাজ করেছে। ইউনুস ভাই টিপস দিতেন, গাইড করতেন। ফলে আর্ট কলেজে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে যা যা শেখানো হয় তার প্র্যাকটিসের ভেতরেই আমি ছিলাম। ইউনুস ভাই বাবাকে প্রেশার দিয়ে বলেন যে, শিশিরকে আর্ট কলেজে পাঠান, আমি আছি। কিন্তু মাসে মাসে তো আলাদাভাবে টাকা দিতে হবে। বাবা ঠিক জোর পাচ্ছিলেন না। তখন মা বললেন, তুই যা। ইউনুস ভাইয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। প্রথম হলাম অ্যাডমিশন টেস্টে। সেটা সাতাত্তর সালের কথা।

মারুফ : আমি আর্ট কলেজকে দেখছি আশি থেকে, আপনি দেখছেন আরো তিন বছর আগে থেকে। সেই সময়ে আর্ট কলেজে শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলুন।

শিশির : তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল না আর্ট কলেজের। আর্ট কলেজে ছিল কলেজের পরিবেশ। ম্যাট্রিক পাস করেই ভর্তি হওয়া যেতো। ফার্স্ট ইয়ার-সেকেন্ড ইয়ার মিলে ছিল প্রিডিগ্রি, অর্থাৎ

ইন্টারমিডিয়েটের সমমান। থার্ড ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ার পর্যন্ত ছিল ব্যাচেলর ডিগ্রি বা বিএফএ। আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে এসেছিলাম, ফলে কলেজের পরিবেশ সম্পর্কে আমি অভিজ্ঞই ছিলাম। যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় তারা সব আমার কাছাকাছি বয়সের হলেও আর্ট কলেজে তারা আমার সিনিয়র। যেমন, নিসার, ওয়াকিল, জুইস। ওরা সবাই খুব ভালো কাজ করতো। তখন একটাই হোস্টেল ছিলো আর্ট কলেজের, নিউমার্কেটের পিছনে শাহনেওয়াজ হল। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো খুবই আন্তরিক ও কাজকেন্দ্রিক। হলের টিভিরুমে জুনিয়রদের বেশি সময় কাটাতে দেখলে সিনিয়ররা বলতেন, যাও, কাজ করতে যাও। ভালো আঁকতে হবে, প্রতিযোগিতা করতে হবে। এরকম একটা সুস্থ অবস্থা ছিলো। প্রথম বর্ষে আমাদের শিক্ষক ছিলেন মাহবুবুল আমিন, শহীদ কবির, মাহমুদুল হক। শিড়াকের খুবই ভালো কম্বিনেশন ছিল সেটা। ছবি আঁকার ভেতরে একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার আছে যেটা হ্যান্ডেল করতে সাহস লাগে। শহীদ কবির সেই সাহস যোগাতেন। মাহবুবুল আমিন ছিলেন ভীষণ একাডেমিক। ছাত্রদের তিনি নির্দেশ দিতেন যে, এই খাতাটা এক মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে ছবি এঁকে। তিনি হোমওয়ার্ক দিতেন কলেজ বন্ধ হলে। নিখুঁত ও ডিটেইল ওয়ার্ক পছন্দ করতেন তিনি। অপরদিকে ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা হলে আমরা মাহমুদুল হকের সঙ্গে নির্দ্বিধায় আলাপ করতে পারতাম। একটা বিষয় তখনও ছিল, এখনও শিক্ষক হিশেবে আমরা অনুসরণ করে থাকি। সেটা হলো, ভালো কাজ যারা করে তাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা। তারা যেন অন্য পথে চলে না যায়, ডেডিকেশন নষ্ট না হয়, সেসব খেয়াল রাখা। ক্লাসের ৫০ জনের ভেতর অন্ততো ১০ জনকে একটা গ্রেডে আনার টার্গেট থাকতো তাঁদের। তবে একটা ক্রাইসিস ছিল, সেটা হলো ইন্টালেকচুয়ালি ডেভেলপ হওয়ার জন্যে যে পড়াশুনা করার দরকার সে-বিষয়ে যথেষ্ট পরামর্শ তাঁদের কাছ থেকে আমরা পাইনি। তবে ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার জন্যে শিড়ার্থির প্রধানত দক্ষতাটা বাড়ানো দরকার। সেটা পেয়েছি আমরা ওই তিন শিক্ষকের কাছ থেকে। তখন বার্ষিক প্রদর্শনীগুলো ছিলো মেজর ইভেন্ট, যে-বিষয়টি বর্তমানে ভীষণভাবে অধোগামী হয়েছে। আমরা আমাদের সেরা ছবিগুলো জমা দিতাম বার্ষিক প্রদর্শনীতে। লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে শেষদিন ছবি জমা দিতাম সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে। কে পুরস্কার পাচ্ছে এ নিয়ে আমরা টেনশনে থাকতাম। শিক্ষকরা, বড় ভাইরা গাইড করতেন। ইউনুস ভাই আমাকে সাবজেক্টই সাজিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, এটা দেখে স্কেচ করো। ওই কাজটি করে আমি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পাই কলেজে।

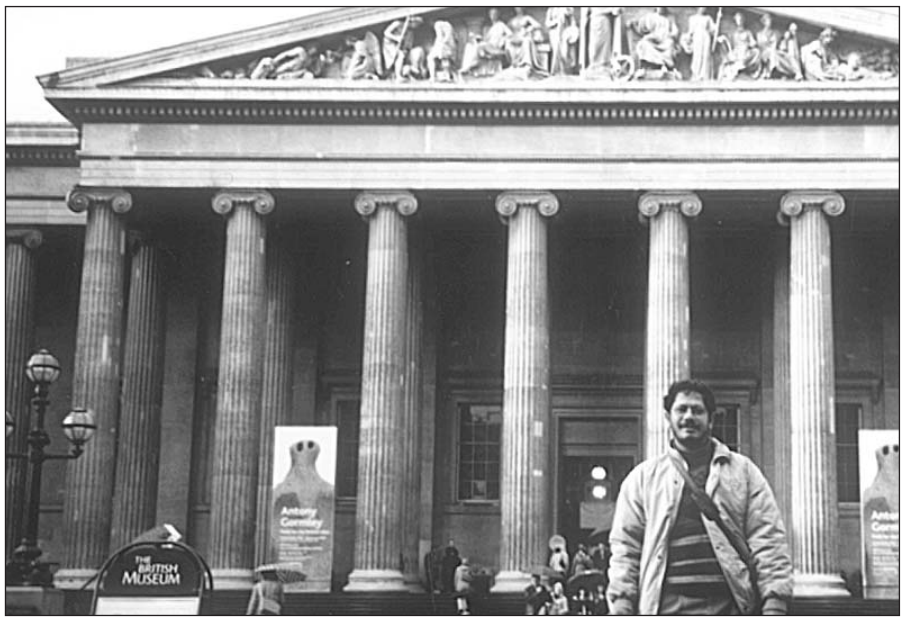

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সামনে, ২০০২

এরপর এক সময় কলেজ হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট। পাঁচ বছরের কোর্স নেমে এলো চার বছরে। অন্যদিকে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হলো ইন্টারমিডিয়েট। এমএফএ-ও চালু হলো। সারা দেশে শিক্ষাঙ্গনের যে অবস্থা বিরাজমান, তারই প্রভাব পড়লো এই আর্ট কলেজে।

মারুফ : কিন্তু এখন যেটা দেখি যে, কমার্শিয়াল কারণে আর্টের একজন স্টুডেন্ট বাইরে কাজ করছে। আপনাদের সময়ে সেটা মনে হয় ছিল না। এতে শিক্ষার্থীর শিল্পসাধনা নিশ্চয়ই ব্যাহত হয়।

শিশির : আসলে সে-সময় সেশন জ্যাম ছিল না, ফলে নির্দিষ্ট সময়ে পাস করে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ ছিল। এখন সেটা নেই। এখন ব্যাচেলর ডিগ্রি নিতে ছয়-সাত বছর লেগে যাচ্ছে। ফলে ছাত্রজীবনেই বাইরের অর্থকরী কাজের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত হচ্ছে বাধ্য হয়ে। কারণ অন্য ডিপার্টমেন্টে তার সমবয়সীরা পড়ালেখা শেষ করে কর্মজীবনে ঢুকে যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক উপলক্ষ তৈরি হয়েছে, শর্টকাটেও অনেক কিছু করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্টের সামনে অনেক হাতছানি। বিলাসী জীবনের জন্যে তার বেশি টাকা দরকার, সেই টাকা জোগাড়ের রাস্তাও খোলা। কম্পিউটার এনিমেশনসহ নানা কিছুর অপশন আছে। আগে এসমস্ত ছিল না। তবে একেবারেই যে কমার্শিয়াল কাজ হতো না, তা নয়। আগে ট্রেড ফেয়ারে বড় শিল্পীর সহযোগী হয়ে কাজ করতাম আমরা। পয়সা পেতাম। ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং, পোস্টার লেখা– এসব কাজেও আয় হতো। আর্টটাকে ভালো করে শিখতে হবে, লেগে থাকতে হবে– এমন একনিষ্ঠ ছাত্র আমরা এখন হাতে গোনা দুয়েকজন পাই।

যে সামাজিক পীড়নে আমি কার্টুন করছি, সেই একই পীড়ন ধারণ করে আমি ছবি আঁকছি। আমার পক্ষে সম্ভব নয় এই বাস্তবজগৎকে বাদ দিয়ে একটা নিভৃত জগতে গিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা

মারুফ : আপনারা যেমন গাইড করার মতো টিচার পেয়েছিলেন, এখন সেই পরিবেশ আছে কিনা?

শিশির : আসলে একজন ভালো শিক্ষকের সৎ উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকা উচিৎ। ইউনিভার্সিটি টিচার হলে সুযোগ-সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে। তাই লাইনঘাট করে হয়ে গেলাম চারুকলার শিক্ষক। এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে এখন। সম্মানজনক এবং দায়িত্বশীল পেশা হিসেবে এখন আর তেমন কেউ শিক্ষকতাকে গ্রহণ করছেন না। বরং অন্য কাজের প্ল্যাটফর্ম হিশেবে নিচ্ছেন এই পেশাকে। সুতরাং আগের শিক্ষকদের তুলনায়

বর্তমান শিক্ষকদের বড় পার্থক্য হচ্ছে– এখন ডেডিকেশন কম, সিনসিয়রিটি কম।

মারুফ : শিল্পীর জন্মস্থান বলতে পারি আর্ট কলেজকে। দেখা যাচ্ছে, প্রথমত একাডেমিক কোর্সের পরিবর্তন হয়েছে, দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থিদের মনমানসিকতার রূপান্তর ঘটেছে, তৃতীয়ত যোগ্য, নিবেদিত, আদর্শবান শিক্ষক তেমন একটা আসছেন না। তাহলে এদেশে শিল্পচর্চার ভবিষ্যৎ কী?

শিশির : শিল্পচর্চার ভবিষ্যৎ ধোঁয়াশাই দেখি আমি, তবু আশার কথা যে ইনস্টিটিউটে এখনও মূল্যবোধসম্পন্ন কিছু সিনিয়র শিক্ষক আছেন। কিবরিয়া স্যার অসুস্থ। তবে আসেন সফিউদ্দিন আহমেদ, রফিকুন নবী, বুলবন ওসমান, আবদুল মতিন সরকার। আসেন কাইয়ুম স্যারও। ৫০ জন শিক্ষকের ভেতর ১০ জন তো আছেন নিবেদিতপ্রাণ। এটাই ভরসার জায়গা। পেইন্টিংয়ে বছরে নতুন স্টুডেন্টের ভেতর সর্বোচ্চ ৫ জন পাই যাদেরকে পছন্দ করতে পারি। এরা যদি ভালো শিল্পী হয়ে উঠতে পারে, যদি এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ শিক্ষকতা পেশায় আসে, তাহলে আশাবাদী হতে পারবো। কিন্তু এমন নিশ্চয়তা তো মেলে না যে তারা শিক্ষক হিসেবে আর্ট কলেজে প্রবেশাধিকার পাবে। আমি এখন ছাত্রদের উপদেশ দিতে ভয় পাই। কারণ সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমি তাকে কোনো সহযোগিতা করতে পারবো না।

মারুফ : প্রসঙ্গান্তরে আসি। শৈশবে পোর্ট্রেট আঁকার মাধ্যমেই বলা যায় আপনার শিল্পচর্চার শুরু। মানুষের মুখের আদল আঁকতেন হুবহু। পরবর্তীকালে আপনি সেই অবয়ব বদলে দিতে শুরু করলেন, ভাঙতে থাকলেন, ক্যারিকেচার করতে লাগলেন। তার মানে, মানুষের চরিত্র তার চেহারার মধ্যে এনে কার্টুন করলেন। এভাবে আপনার ক্ষেত্রে শিল্পের আঙ্গিক পরিবর্তিত হলো। প্রথমে জানতে চাইবো, কার্টুনটাকে আপনি আর্ট মনে করেন কি না।

শিশির : মাস্টার্স করার সময় আমি সচেতনভাবেই বেছে নিই 'আর্ট অ্যান্ড ক্যারিকেচার' বিষয়টি। গাইড হিশেবে পেয়েছিলাম উপমহাদেশে আর্টের ব্যাপারে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি গোলাম মোহাম্মদ শেখকে। গুজরাটি ভাষার একজন খ্যাতিমান কবিও তিনি। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেবার সময় আমি কোনো দ্বন্দ্বে যাইনি বা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিনি যে কার্টুন হলো শিল্প। তবে একটা বিষয় কি, আর্ট হলো ভিজুয়াল ডকুমেন্ট; একজন ব্যক্তির দৃশ্যমান অভিব্যক্তি। তার একটা ভিজুয়াল কোয়ালিটি আছে। আর্ট যদি দর্শকদের দেখার জন্যে সত্য প্রকাশের ভিজুয়াল ফর্ম হয়, সে-বিচারে কার্টুন বা ক্যারিকেচার হলো একজন আর্টিস্টের রিফ্লেকশন। সমাজে যদি এমন অবস্থা বিরাজ করে যে তার একটা আর্টিস্টিক ডকুমেন্টেশন দরকার। শিল্পীর ক্যানভাসে যদি সেটা না মেলে, আর কোনো শিল্পী বা কার্টুনিস্ট যদি সেটা ক্যারিকেচারে ধরে রাখেন, তবে তার ভ্যালু হবে 'মোর দেন আর্ট'। আমরা যদি পিকটোরিয়াল হিস্ট্রি (সচিত্র ইতিহাস) সামনে নিয়ে বসি তাহলে দেখবো যে প্রচুর কার্টুন আছে, ড্রইং আছে যেসব বিষয়ে ভালো লেখা কিংবা আলোকচিত্র নেই। শিল্পীরা, কার্টুনিস্টরা ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে গেছেন ছবি দিয়ে কার্টুন দিয়ে। সেসব ডকুমেন্ট রচনা করার সময়ে তারা চিন্তা করেননি যে, তার কাজটা ইলাসট্রেশান হচ্ছে, না কার্টুন হচ্ছে, নাকি ফাইন আর্ট হচ্ছে। তারা দায়বদ্ধতা থেকে কাজটা করে গেছেন। ৫০০-৭০০ বছর পরে সেসব কাজ সামাজিক মূল্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। কখনো কার্টুন নিশ্চয়ই বিনোদনের জন্যে ছিলো না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলবো, আমি আমার কার্টুনকে কখনোই খাটো করে দেখি না।

মারুফ : তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কার্টুন হলো 'পার্ট অব আর্ট'?

> **পাশ্চাত্যকে আমরা শিল্পের একটা মানদণ্ড হিসেবে ধরেই নিয়েছি। ওরা প্রশংসা করলে আমরা বর্তে যাই। এইসব ঘোর আমার কেটে গেছে বিদেশে গিয়ে। আমি মনে করি যতটুকু আমার আছে সেটুকুকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি তবে সেটাই যথেষ্ট। এই আত্মবিশ্বাস অর্জনই আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। পিকাসোর অনেক কাজই আমার কাছে অতিসাধারণ বলে মনে হয়েছে**

শিশির : পার্ট অব আর্ট তো অবশ্যই। এটার ফর্ম হচ্ছে গ্রাফিক ফর্ম। আমি একটাই উদাহরণ দেবো। কামরুল হাসানের আঁকা ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' কাজটি হলো ক্যারিকেচার। ওটা কিন্তু ফাইন আর্ট না। পাশব একটা চেহারা দিয়ে তৈরি পোস্টার। এটা কী দারুণ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। কিবরিয়া, সুলতান কিংবা এই কামরুল হাসানেরই নিজস্ব রীতির ছবির একটা শিল্পমূল্য রয়েছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে ছবির ওই ভাষা ছাড়া অন্য কোনোভাবে ইয়াহিয়া খানের বা হানাদারদের চরিত্র প্রকাশ করা যেতো না। কামরুল হাসানের ওই ক্যারিকেচারটি অবশ্যই মোর দেন আর্ট। অনেক গান আছে আমাকে উদ্বেলিত করে, আমাকে চার্জড করে দেয়। সেটা হয়তো শুদ্ধ সঙ্গীত নয়। কিন্তু আমার কাছে ওই

এরশাদ : নব্বইয়ে পতনের আগে সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচ্ছদে, এবং সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনে

গানের গুরুত্ব অন্যরকম। ছবির বেলায়ও তাই। তবে হ্যাঁ, কার্টুনিস্টের সেই কোয়ালিটিও থাকতে হবে।

মারুফ : এস্থেটিক্যাল কোয়ালিটি?

শিশির : হ্যাঁ। আমি কিন্তু কার্টুনকে ফাইন আর্ট বলছি না। আমি এর ভ্যালুটার কথা বলছি।

মারুফ : সামাজিক অঙ্গীকারবোধ থেকে একজন শিল্পী সরাসরি মিছিলে যেতে পারেন। আবার ছবি কিংবা কার্টুনও আঁকতে পারেন। দুটো দুই জিনিস।

শিশির : দুটোরই দরকার আছে।

মারুফ : কার্টুনে আপনি ব্যক্তি ও সামাজিক প্রবণতার সমালোচনা করেন, বিদ্রূপ করেন। আপনার ছবি সময়কেই পোর্ট্রেট করে। চোখে দেখার যে সুন্দরতা, যে লালিত্যবোধ, আপনার ছবিতে সেটা নেই। আছে বীভৎসতা, ফিগারের বিকৃতি, অপতৎপরতা। ওই ছবি স্বস্তির সঙ্গে দেয়ালে ঝোলানো চলে না। তার মানে কার্টুন এবং চিত্রকলা– দুটোতেই আপনি সমাজের সমালোচনা করছেন।

শিশির : আমি তো একই ব্যক্তি যে একদিকে কার্টুন করছে, অন্যদিকে পেইন্টিং করছে। আমি যেভাবে চিন্তাভাবনা করি, আমার কার্টুন হচ্ছে তার সিনথেসাইজ সিম্পল ফর্ম্যাট। এটা গ্রাফিক মিডিয়া, যেটা ছাপা হবে এবং লক্ষজনের কাছে যাবে। সাধারণ মানুষের জন্যে যখন আমি ইলাসট্রেশান কিংবা কার্টুন করবো তখন সহজবোধ্যতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কেননা সাধারণ মানুষ ফাইন আর্ট বোঝে না। তার মানে সহজবোধ্যতার একটা শর্ত এখানে চলে আসছে, পাশাপাশি আছে পত্রিকার পলিসি, আছে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন। অন্যদিকে আমি যখন আমার নিজের ছবি আঁকি, সেখানে একই ভাবনা-চিন্তা কাজ করে। অথচ সেক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। যে-সামাজিক পীড়নে আমি কার্টুন করছি, সেই একই পীড়ন ধারণ করে আমি ছবি আঁকছি। আমার পক্ষে সম্ভব নয় এই বাস্তবজগতকে বাদ দিয়ে একটা নিভৃত জগতে যেয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা। ছবি আঁকার সময়ে আমার জনগণের কাছে সহজগম্য হওয়ার দায় নেই, অনেক স্বাধীনভাবে আমি আঁকতে পারি; আমার না-বলা কথা, আমার ভেতর-বাহিরকে, চোখ খুলে দেখা এবং চোখ বন্ধ করে দেখা সবকিছুকে।

মারুফ : আমি যদি বলি যে, সমাজ আপনার ভেতরে যে অভিঘাত তৈরি করছে তার প্রতিক্রিয়া দুটি ধারায় দুটি মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে– একদিকে কার্টুন, অপরদিকে পেইন্টিং।

শিশির : হ্যাঁ, এভাবে দেখা যায় কিন্তু। আমি জানি যে সবাই ফাইন আর্ট বোঝেন না। আর সবার বোঝার জন্যেও এই মিডিয়াটি না।

মারুফ : তাহলে আপনাকে প্রবলভাবে একজন রাজনৈতিক শিল্পী বলা চলে?

শিশির : 'প্রবল' এমন বিশেষণ দেয়ার দরকার নেই। প্রবল হতে গেলে অনেক কৌশলী হতে হয়। রাজনীতির ভেতর কৌশল আছে, অনেক যুক্তিতর্ক আছে। আমি নিজেকে মোটামুটি সচেতন একজন মানুষ মনে করি।

মারুফ : যদি বলি, আপনার ছবি একরৈখিক। বহুমাত্রিক নয়। তাহলে?

শিশির : তাহলে বিষয়টি খুব লঘু করে দেখা হবে। আমার কাজের

ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের একটা ফিলিং তৈরি হয় যার ব্যাখ্যা সে দিতে পারে না। এটাও একটা এবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটি। আমি চাই আমার ছবি দর্শক অনেকক্ষণ ধরে দেখুক, বাসায় এসেও মনশ্চক্ষে সেই ছবিটা বা ছবিগুলো আবার দেখুক

মধ্যে আমি এবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটিটাকে ইন করাই। এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে আসে। ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের একটা ফিলিং তৈরি হয় যার ব্যাখ্যা সে দিতে পারে না। এটাও একটা এবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটি। আমি চাই আমার ছবি দর্শক অনেকক্ষণ ধরে দেখুক, বাসায় এসেও মনশ্চক্ষে সেই ছবিটা বা ছবিগুলো আবার দেখুক।

মারুফ : তার মানে শিহরণ জাগা, তাড়িত হওয়া– এগুলো চাইছেন?

শিশির : হ্যাঁ। এটা আর্টের সাবজেকটিভ কোয়ালিটি, অবজেকটিভ কোয়ালিটি না। এই সাবজেকটিভ কোয়ালিটিটাই হচ্ছে এবস্ট্রাকশন। আমার মতে, এটাই বহুমাত্রিকতা। এটা একমাত্রিক হলে ছবিতে যা বর্ণনা আছে সেটার বাইরে দর্শক কিছু ভাবতে পারতো না। সাহিত্যে যেমন

শিশির ভট্টাচার্য্যের চিত্রকর্ম : খেলা দেখে যান বাবু-১২, ১৯৯৬

ম্যাজিকাল রিয়ালিটি (জাদুবাস্তবতা) এসেছে, পেইন্টিংয়েও এভাবে আসে ম্যাজিকাল রিয়ালিটি।

মারুফ : আমার মনে হয়, আপনার প্রথম পরিচয় আপনি একজন শিল্পী। যদিও ওই পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছে আপনার কার্টুনিস্ট পরিচয়। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে নেন?

শিশির : পপুলার মিডিয়ার কারণে বেশি লোক আমাকে কার্টুনিস্ট হিশেবে চেনে। এটা আমার খারাপ লাগে না। খারাপ লাগতো যদি আমার ছবি আঁকা বন্ধ থাকতো, যদি শুধু কার্টুনই করতাম। কিন্তু আমি তো নিয়মিত চিত্রচর্চা করি। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছি।

মারুফ : দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রতিদিন না হলেও প্রতি সপ্তাহে আপনার আঁকা একাধিক কার্টুন দেখতে পান পাঠক। স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে আপনি কি নিজের মন মতো সাবজেক্ট নিয়ে কার্টুন আঁকেন, নাকি কর্তৃপক্ষ আপনাকে সাবজেক্ট দেয়। আপনার কোনো কার্টুন পত্রিকার পলিসির কারণে প্রকাশ-স্থগিত থাকে কি না। পুরো বিষয়টি যদি স্পষ্ট করেন।

শিশির : কার্টুনিস্টের জন্যে স্বাধীনতাটা জরুরি। পত্রিকার পক্ষ থেকে ফ্রিডম থাকতে হবে। সচরাচর আমি যেসব কার্টুন করি সেগুলোকে এডিটরিয়াল কার্টুন বলা যায়। এটা এডিটরিয়াল পেজে যেতে পারতো। ফ্রন্ট পেজের আকর্ষণ বেশি বলে এটা সেখানেই যাচ্ছে। যেহেতু এটা পত্রিকার ফ্রন্ট পেজে যাচ্ছে, তাই এমন কোনো ব্যক্তিগত আইটেম থাকবে না যা পত্রিকার পলিসির সঙ্গে মেলে না। সে-বিবেচনায় বলা যায়, ব্যাপারটি পুরোপুরি স্বাধীন না। তাও যথেষ্ট স্বাধীন। আমি দীর্ঘদিন ধরে একই টিমের সঙ্গে কাজ করছি, তাই পরস্পর বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গেছে। তারপরও যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্যে আমি পলিসিটা জেনে নিই। সীমানাটা বুঝে নিই। আরেকটা বিষয় হলো সেল্ফ সেন্সরশিপ। পত্রিকা যদি বলে দেয় যে, তুমি পুরোপুরি স্বাধীন, আমরা কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবো না। তখনও যা খুশি তাই আঁকা যায় না। সমাজের অনেক কিছু থাকে, দেশের অনেক কিছু থাকে, মূল্যবোধ থাকে। এসব বিচার করে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কার্টুন করা যায় না। আর থিম কিংবা সাবজেক্ট আমিই ঠিক করি, কিন্তু নিউজ এডিটর বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। পত্রিকায় কোনো নিউজ নাই, ফলোআপ নেই এমন কোনো সাবজেক্ট আমি কার্টুন আঁকার জন্যে নির্বাচন করি না। ওরা ইস্যু সম্পর্কে আমাকে অবগত করেন। সেই ইস্যুকে ভিত্তি করে আমি কার্টুনের পরিকল্পনা করি।

মারুফ : আপনার ক্ষেত্রে কখনো এমন হয়েছে কিনা যে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আপনাকে একটা থিম দিলো, কিন্তু আপনি সেটা করতে ইচ্ছুক নন, তার পরও করে দিতে হলো?

শিশির : এখন পর্যন্ত এরকম কিছু হয়নি।

মারুফ : আপনি ভাবলেন যে, এখন দেশের যে অবস্থা, সমাজ যেদিকে যাচ্ছে, রাজনীতি যে মোড় নিচ্ছে– এমন একটা পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট এই বিষয়টি নিয়ে এখনই কার্টুন যাওয়া দরকার, অথচ আগে থেকেই কর্তৃপক্ষ সেন্সর করে রাখলো বিষয়টা। এমন হয়?

শিশির : এটা হয়, অনেক দিন ধরেই হচ্ছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কখন কোন পলিসিতে পত্রিকাটা চলছে সেটা কিন্তু অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। যেমন সরকার বদল হলে পলিসি চেঞ্জ হয়, সরকারের কার্যকালের শেষের দিকে আবার পলিসি চেঞ্জ হয়। প্রথম দু'বছর পত্রিকা সরকারকে ছাড় দিলো। তৃতীয় বছর থেকে একটু-আধটু সমালোচনা শুরু করলো। তখন বলা যাবে যে, আমরা তো তোমাদের অনেক ছাড় দিয়েছি, তোমরা এগুলো ঠিক করেনি। একটা পর্যায়ে গিয়ে সবাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। তখন আবার কঠোর লেখালেখি শুরু হলো। এভাবেই চলে। কার্টুন কিন্তু একই ধারায় চলছে। তবে আমি অনেক সময় কৌশলে অনেক কিছু প্রকাশ করে ফেলি যা তাৎক্ষণিকভাবে পত্রিকার লোকজন ধরতে পারেন না। পরে প্রতিক্রিয়া হলে চিন্তিত হয়ে পড়েন তারা।

মারুফ : প্রশংসা নিশ্চয়ই অনেক পান। কিন্তু আমি জানতে চাইবো নিন্দা কিংবা হুমকির কথা। কার্টুনে সমালোচিত/আক্রান্ত ব্যক্তি বা মহল ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। এরশাদ আমলের কথা স্মরণে রেখেই আপনি এবিষয়ে কিছু বলুন আমাদের।

শিশির : চূড়ান্ত পর্যায়ের কিছু এখনও হয়নি। হয়েছে আসলে টেলিফোনে। ফোনটা অফ করে দিলেই হতো। গালি-গালাজ কত প্রকার ও কী কী– এসব দেখেছি আমি। মামলায় জড়াইনি এখনো। তবে একবার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আগাম সতর্কতা হিসাবে কার্টুনের একটা ব্যাখ্যা ছেপেছিলো।

মারুফ : কার্টুনটা কাকে নিয়ে ছিলো?

শিশির : সাইফুর রহমানকে নিয়ে।

মারুফ : এখন পর্যন্ত আপনি শারীরিকভাবে আক্রান্ত হননি, কিংবা মানহানির মামলায় পড়েননি। তার পরও কখনো বিপন্নবোধ করেন কিনা?

শিশির : আগে ছিল না এটা, ইদানীং মনে হয়। আঘাত বা লাঞ্ছিত করার বিষয়টি এখন অহরহই ঘটছে। একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেয়া কোনো ব্যাপারই নয় এখন। ঘটিয়ে দিয়ে মাফ-টাফ চাইলো আরকি। এখন এই ভয়টা বেশি লাগে। কিছুটা বিপন্ন বোধ করি। আমার চেয়ে আমার শুভানুধ্যায়ীরাই বেশি উৎকণ্ঠিত থাকেন। আর প্রথম আলোর সম্পাদক শঙ্কায় থাকেন আমাকে নিয়ে। মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

মারুফ : এরশাদের আমলে আপনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন, তখন কী সাহসী সব কার্টুন এঁকেছেন। এরশাদ ছিল স্বৈরাচারী, সে গায়ের ওপর গাড়ি তুলে দিয়ে ছাত্রদের মেরেছে। তখন কি এতখানি বিপন্ন বোধ করতেন?

শিশির : সে-সময় 'দেশবন্ধু' ও 'পূর্বাভাস' পত্রিকায় স্বৈরাচারবিরোধী কার্টুন করেছি। দুটো পত্রিকারই সাংবাদিকদের মনোভাব ছিলো এরশাদবিরোধী। সে-সময় আসলে সব শ্রেণী ও পেশার মানুষই স্বৈরাচারী সরকারের বিরোধিতা করেছেন। কার্টুনিস্টের ভরসা হচ্ছে জনমত, সে-কালে জনমত ছিল স্বৈরাচারবিরোধী। তাই আমি বেশি সাহস দেখাতে পেরেছিলাম, সাহস দেখিয়েছিলেন কলামিস্ট, লেখক, কবি-শিল্পীরা। এক পর্যায়ে স্বৈর সরকার পত্রিকার সমালোচনা গায়ে মাখতো না। এখন যেমন এই সরকার সমালোচনাকে পাত্তা দিচ্ছে না। বলছে, পত্রিকা যা লেখে লিখুক, আমরা পড়বো না, গায়ে মাখবো না। এখন কিন্তু একটা সুযোগ আছে সরকারের বেশিবেশি সমালোচনা করার।

মারুফ : বলা যায়, স্বাধীনতার পরে রনবীর হাত ধরেই এদশে সমাজসজ্ঞান সফল কার্টুনের সূচনা। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আপনিও সেই ধারাটিকে আরো বেগবান করেছেন। আপনার কি মনে হয় যে, আমরা নতুন কার্টুনিস্ট পাচ্ছি না?

শিশির : না, আমার তা মনে হয় না। এখন প্রচুর কার্টুনিস্ট তৈরি হচ্ছে। প্রায় প্রতিটা পত্রিকাই কার্টুন ছাপছে। এখন ইত্তেফাকেও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। কেমন হলো না হলো সেটা পরের প্রশ্ন। আমার ছাত্র কুদ্দুস সংবাদেএ অনেক দিন ধরে কার্টুন করছে। নজরুল, হুদা, শাহরিয়ার, মেহেদি, ইব্রাহিম মণ্ডল, বিপুল শাহ– এরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে, ম্যাগাজিনে পলিটিক্যাল কার্টুন করছে। নবী স্যার অনেক দিন কার্টুন বন্ধ রেখেছিলেন দৈনিক পত্রিকায়। এখন জনকণ্ঠ বাধ্য হচ্ছে নবী স্যারকে (রনবী) দিয়ে কার্টুন করাতে। আগে শুধু 'উন্মাদ' বেরুতো। এখন পত্রিকার সাথে কার্টুন ম্যাগাজিন 'আলপিন', 'বিচ্ছু' বেরুচ্ছে। কার্টুন এখন জনপ্রিয় হয়ে গেছে বলেই পত্রিকাগুলো কার্টুন রাখছে, এটা পত্রিকার অনিবার্য অংশ হয়ে উঠেছে।

অনেক শিল্পী চর্বিতচর্বনের মতো কাজ করে যাচ্ছে। দেখে কোনো লাইফ পাওয়া যায় না, উত্তেজনা তৈরি হয় না। সমালোচনাও দাঁড়িয়ে গেছে একটা রুটিন ওয়ার্কে। এটা নিয়েও যেন কারো কোনো জিজ্ঞাসা নাই

মারুফ : কার্টুনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক. ফিগারে বা ক্যারিকেচারে শিল্পমান বজায় রাখা; দুই. এপ্রোচে বা বক্তব্যে বুদ্ধিদীপ্ততা, তীর্যকতা। এ দুটো বিষয় সমন্বয় করেই হতে পারে মানোত্তীর্ণ কার্টুন। আপনি অনেক কার্টুনিস্টের নাম বললেন। কিন্তু মানের প্রশ্নে আমরা কোন জায়গায় আছি সেটা যদি বিচার করেন...

শিশির : হ্যাঁ, এখানেই একটু ল্যাকিংস্ আছে। মোটা দাগের কার্টুনই বেশি হচ্ছে। আমার কথা আমি বলতে পারি। একটা কার্টুন যতো সহজ-সরলই হোক সেটার পেছনে আমার বেশ বড় একটা সময় চলে যায়। আইডিয়া চূড়ান্ত করতেই সময় বেশি যায়। একই থিম বা ইস্যু নিয়ে আমি কোন কার্টুনটা করবো সেটা ঠিক করতে সময় যায়। আমি প্রথমে ঠিক করি ওই থিম নিয়ে মোটা দাগের কী কার্টুন হতে পারে। ঠিক করেই সেটা

শিশির ভট্টাচার্য্যের শিল্পকর্ম : দি পিকচার, ২০০২

বাতিল করে দিই। কারণ ওরকম মোটা দাগে কার্টুন করার জন্যে আরো দশজন আছে। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আইডিয়া করি। সেগুলো থেকে একটা বেছে নিয়ে কার্টুন করি। সে কারণে সময় বেশি লাগে। অনেক ছোট ছোট স্কেচ করি আমি। ছবি এঁকে কথা বসিয়েও অনেক সময় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পারলে কার্টুনটা ড্রপ করি। মানে পত্রিকাকে বলে দিই যে আজ আর কার্টুন দিতে পারলাম না। ওরা হতাশ হয়, কারণ কার্টুনের জন্যে হয়তো জায়গা রাখা ছিলো। আবার এমনও হয় যে, একটি কার্টুন অনেক দূর আঁকার পর ব্যাপক একটা পরিবর্তন আনলাম।

মারুফ : আপনি বিদেশে গিয়েছেন কাজের সূত্রে?

শিশির : ম্যানিলায় গিয়েছিলাম অনেক আগে। ইউনিসেফের মিনা কার্টুন শুরুর সময়ে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত ও পাকিস্তান– চার দেশ থেকে চারজন শিল্পী গিয়েছিলাম। আমি মাস্টার্স করেছি ভারতের বরোদায়। লন্ডনে 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স' পাই ২০০২ সালে, দেড় মাস সেখানে থেকে ছবি আঁকার কাজ ছিল সেটা। পরে অনেকের সাথে প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করি। এরপর ডেনমার্কে যাই একটা গ্রুপ প্রদর্শনী উপলক্ষে। লন্ডনে থাকার সময়েই জার্মানী আর প্যারিস ঘুরে আসি, লুভ মিউজিয়াম দেখে আসি। পাঁচ বছর পরপর জার্মানিতে আন্তর্জাতিক একটা শিল্পপ্রদর্শনী হয়। আমি যখন জার্মানি যাই তখন সেটা চলছিলো। ওটার অভিজ্ঞতা আমার জন্যে বিশাল প্রাপ্তি। এতকাল বইয়ে যাদের সম্পর্কে পড়েছি, যাদের কাজ দেখেছি, বিদেশে স্বচক্ষে তাদের কাজ দেখতে পাওয়া বিরাট একটা অভিজ্ঞতা। সেটার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। বিদেশে গেলে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়। সেটা হলো আমি কোন অবস্থানে আছি। পাশ্চাত্যকে আমরা শিল্পের একটা মানদণ্ড হিসেবে ধরেই নিয়েছি। ওরা প্রশংসা করলে আমরা বর্তে যাই। এইসব ঘোর আমার কেটে গেছে বিদেশে গিয়ে। আমি মনে করি যতটুকু আমার আছে সেটুকুকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি তবে সেটাই যথেষ্ট। এই আত্মবিশ্বাস অর্জনই আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। পিকাসোর অনেক কাজই আমার কাছে অতিসাধারণ বলে মনে হয়েছে। নিজের চোখে কাজগুলো দেখতে না পেলে সেটা বুঝতেই পারতাম না। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি– এইসব বড় বড় দেশ সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক– এসব দেশকে পাত্তাই দিতো না। অথচ বাইরে না গেলে আমি বুঝতাম না সমসাময়িককালে এইসব জায়গাতেও কত বড় বড় আর্টিস্ট ছিলো। কেবল শিল্পসৃষ্টিতে নয়, এপ্রোচেও ন্যাশনালিস্ট হওয়া দরকার। ওরা যদি আমাদেরকে উপেক্ষা করে, তাহলে ওদেরকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি। নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারি।

ল্যুভ মিউজিয়াম, প্যারিস, ২০০২

মারুফ : আলোচক-সমালোচকরা স্বদেশী শিল্পীদের আসল সত্তাটিকে তুলে ধরে পাশ্চাত্যের অর্জনের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। বাংলাদেশে চিত্রসমালোচনার ধারা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

শিশির : সমালোচনায় বিতর্ক উত্থাপিত হওয়া জরুরি। এখন যার একটু ধারণা আছে আর্টের ওপরে, সেই লিখছে। কেউ কেউ আবার জেনেবুঝেই লিখছে। কিন্তু পার্থক্যটা করবে কে? আর্ট নিয়ে একটা ফোরামের মতো হতে পারে। যেখানে সেমিনার হবে, বিতর্ক হবে, মূল্যায়ন হবে। আরেকটি কথা, অনেক শিল্পী চর্বিত চর্বনের মতো কাজ করে যাচ্ছে। দেখে কোনো লাইফ পাওয়া যায় না, উত্তেজনা তৈরি হয় না। সমালোচনাও দাঁড়িয়ে গেছে একটা রুটিন ওয়ার্কে। এটা নিয়েও যেন কারো কোনো জিজ্ঞাসা নাই। কারো ছবি যদি অপছন্দই হয়, তাহলে যুক্তি দিয়ে সেটা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

মারুফ : গত দেড়-দুই দশকে বাংলাদেশে অনেক গ্যালারি হয়েছে, ছবির বাজার তৈরি হয়েছে। এটা তো সুলক্ষণ।

শিশির : হ্যাঁ, এটা এপ্রিশিয়েট করার মতো। লিভিং আর্টের জন্যে এটা ইতিবাচক। তবে স্রেফ ডেকোরেশন পিস হিসেবে ছবি বিক্রি হলে সেটা আর্টের জন্যে শুভ ফল বয়ে আনবে না। তাছাড়া বড় বড় শিল্পীর কাজ নিলামে ওঠা উচিত। এস এম সুলতানের একটা কাজ চুপিচুপি হাতবদল হবে– এটা কাঙ্খিত নয়। নিলামে উঠলে আলোচনা হবে, জমে উঠবে শিল্পের বাজার। এতে আর্টিস্টরা উৎসাহিত হবেন।

মারুফ : আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে পাঠকদের...

শিশির : আমি বিয়ে করেছি শিল্পী ক্যামেলিয়া পারভীনকে ১৯৯০ সালে। ক্যামেলিয়া আমাদের আর্ট কলেজ থেকেই ওরিয়েন্টালে মাস্টার্স করেছে। আমাদের একমাত্র কন্যা শ্রাবন্তি সুচন্দ্রিমা ওয়াই.ডব্লিউ.সি.এ. স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আমি সাধারণ জীবনযাপন করতেই পছন্দ করি। টেলিভিশনে যেতে চাই না, তাহলে এলাকার লোকে চিনে ফেলবে। আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি, বাজারঘাট করি। দশজনের ভেতরে থাকলে কেউ যদি আমাকে বিব্রত না করে, কারো কোনো অসুবিধা না হয়– এমন একটা অবস্থানই আমার কাম্য। কাজের জন্যেও উপকারী। নাট্যকার হাবিব তানভিরের নাটক আছে 'আগ্রাবাজার', 'চরণদাস চোর'। পেইন্টিংয়ে ওরকম লেবেলের একটা কিছু করার ইচ্ছা আমার রয়েছে। সেজন্যে কোনো অভিজাত পরিবেশে জীবনযাপন করা আমার জন্যে ঠিক হবে না।

মারুফ : সেজন্যে তো সিরিজ ওয়ার্ক করতে হবে।

শিশির : আপনি ঠিকই বলেছেন, সিরিজ ওয়ার্ক করতে হবে। কাঁঠালবাগান বাজারে থেকে আমি সমগ্র বাংলাদেশকে ফিল করতে পারি। এটা আমার জন্যে জরুরি।

marufraihan@yahoo.com

(সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয় শিশির ভট্টাচার্য্যের কাঁঠালবাগানের বাসায় গত অক্টোবরে।)